বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা

বিশ শতক

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রাবণী পাল সম্পাদিত

ISBN 978-93-83161-45-4

Bangla Chhotogalpa Paryalochana : Bish Shatak (Vol. II)
Edited by Dr. Srabani Pal, Rabindra Bharati University

প্রথম প্রকাশ
মে ২০২৩

প্রকাশক.
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
অক্ষর প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা ৯
৯৮৭৪৮৪৩৮৬৭

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর

মুদ্রক
বসু মুদ্রণ, কলকাতা ৪

ISBN 978-93-83161-45-4

৪৫০ টাকা

সূচিপত্র

বাংলা ছোটগল্পের ধারা : বিশ শতক — সাত — শ্রাবণী পাল

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩—১৯৩২)

বঞ্চিত মাতৃত্বের প্রতিচ্ছবি : 'কাশীবাসিনী' — ১ — সায়ন ব্যানার্জী

দেবী : মাতৃত্বের মুখ — ৯ — মনামী বসু

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আদরিণী : জয় রামের গল্প নাকি আদরিণীর? — ১২ — সুদীপ মণ্ডল

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প : 'ভিখারী সাহেব' —পিতৃত্বের ভিন্নমুখী বিস্তার — ২১ — সুব্রত দাস

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প : 'বাজিকর' — ২৯ — সুব্রত দাস

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬—১৯৩৮

শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' : বাস্তবতার অন্যরূপ — ৩৫ — মাধুরী বিশ্বাস

শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' — ৪১ — বিশ্বজিৎ পান্ডা

মন্দির : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ৪৮ — শিপ্রা দে

শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' : প্রেমের গল্প নাকি সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ — ৫৭ — সুখেন মণ্ডল

রাজশেখর বসু (পরশুরাম) (১৮৮০—১৯৬০)

পরশুরাম এবং 'কচি-সংসদ' ও 'উলট পুরাণ' — ৬৪ — চৈতালী ব্রহ্ম

পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' : রঙ্গব্যঙ্গের দর্পণে — ৭৩ — বিমলচন্দ্র বণিক

জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬—১৯৫৭)

'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' : ব্যতিক্রমী আখ্যান — ৯৫ — মানিকলাল সাহা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪—১৯৫০)

'মৌরীফুল' : শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় — ১০১ — শিপ্রা দে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিঁদুরচরণ' : অমেয় অভিযাত্রা — ১১০ — নিবেদিতা চক্রবর্তী (দত্ত)

বিভূতিভূষণের উমারাণী : ঝরা বকুলের কান্না — ১১৭ — রণবীর নাথ

জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪—১৯৮৮)

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'—এক ভাঙা স্বপ্নের উপাখ্যান — ১২৬ — গোপা বিশ্বাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯—১৯৭১)

বেদেনী : কামনার লেলিহান শিখা — ১৩৭ — সায়ন ব্যানার্জী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্রদানী' : একটি নিবিড় পাঠ — ১৪৪ — সোমনাথ মণ্ডল

রিরংসার ভিন্ন মাত্রা : 'নারী ও নাগিনী' — ১৫৭ — রুচিরা চন্দ

‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’—এক ভাঙা স্বপ্নের উপাখ্যান

গোপা বিশ্বাস

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষে এল বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘ শাসনের অবসানে এক নতুন ভোরের সূচনা হল। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর শপথবাক্য উচ্চারিত হল— “Long years ago we made a tryst with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge... .”[১]

স্বাধীন ভারতের নতুন প্রভাতে শপথ নেওয়ার এই আনন্দঘন পরিবেশ কিন্তু সমগ্র ভারতবাসীর কাছে শুভ ফল প্রদান করল না। সমুদ্র মন্থনের ফলে অমৃত কলসের সঙ্গে বিষকুম্ভ উঠে আসার মতোই দেশভাগের গভীর ক্ষত স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দকে হতাশায় রূপান্তরিত করেছিল। ইতিহাসের এই তথ্য সাহিত্যের পাতায় রক্তমাংসের সজীবতায় প্রাণ পেয়েছে, বিশেষত সমকালীন লেখকদের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবী দেশভাগের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিককে গভীর মমতায় তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। ছিন্নমূল মানুষের জীবন যন্ত্রণা, তাদের কঠিন জীবন সংগ্রাম, বেঁচে থাকার লড়াই প্রখর বাস্তবতায় উঠে এসেছে ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ ছোটোগল্প ও উপন্যাসে। সব হারানো নিঃস্ব মানুষগুলোর জীবন্ত মৃত হয়ে যাওয়ার কাহিনি এই গল্পে ইতিহাসের সত্যকে নতুন অবয়ব দান করেছে।

লেখিকার কলমে দেশভাগ সমকালীন বাস্তব জীবন তার স্বরূপ নিয়ে সাহিত্যের পাতায় ধরা পড়েছে। বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের রাজনৈতিক ঘটনার ওঠানামা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই বাংলাদেশের বাইরের ঘটনাও তাঁর লেখায় সহজেই জায়গা করে নিয়েছে। সংবেদনশীল ও সহানুভূতির আলোয় মানুষের জীবন যন্ত্রণাকে অনুভব করার প্রচেষ্টা তাঁর কথাসাহিত্যকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। কাহিনির মধ্যে বাস্তবতার ছোঁয়ায় তাই চরিত্রগুলিও রক্তমাংসের সজীবতায় মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। বিশেষত ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ ছোটোগল্পে ছিন্নমূল মানুষের জীবনসংগ্রামের ভয়াবহতা ও তার করুণ পরিণতিকেই স্মরণ করায়।

১৮৯৪ সালে সুদূর রাজস্থানে জয়পুরে জন্ম নিয়েছিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। উনিশ শতকের একেবারে শেষ লগ্নে জন্মগ্রহণ করেও অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের অলিন্দের বাইরে খুব বেশি পা রাখার সুযোগ তাঁর হয়নি। বিশ শতকের প্রথমভাগে শৈশব থেকে কিশোরী হয়ে ওঠার সন্ধিক্ষণে মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় এবং তিনি স্বামীগৃহে যান। পনেরো বছরের সংসার জীবনের স্বল্প সময়ে ছয়টি সন্তানের মা হয়ে পরিপূর্ণ গৃহিণী হয়ে ওঠার সময়ই স্বামী মারা যায় এবং সন্তানদের নিয়ে তিনি পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণা ও সেইসঙ্গে মনোজগতের এক বিরাট শূন্যতা তার লেখক সত্তাকে জাগিয়ে তোলে। সংসারের কোলাহল থেকে দূরে সরে থাকার ও শূন্য

মনের অবলম্বন হয়ে ওঠে বইপড়া ও লেখার অভ্যাস। মনের গভীরে নানা অনুভবের টানাপোড়েন ও কাছ থেকে দেখা অন্তঃপুরের মেয়েদের জীবন সমস্যা এই সবই তাঁর কাহিনির অন্যতম বিষয় হয়ে ওঠে। ছোটো থেকে বাড়িতে সামান্য পড়াশোনার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ সমাপ্ত হতেই সংসারজীবনে প্রবেশ ও অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের মধ্যে তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব আবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ করেই যখন তাঁর সুরক্ষিত ঘেরাটোপ ভেঙে পড়ল তখনই তিনি নিজের অন্তরের শূন্যতা উপলব্ধি করতে পারলেন। জীবনের প্রয়োজনেই বিকল্প দরজা খুলতে হয়েছিল তাঁকে, ভালো থাকার প্রচেষ্টায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন সাহিত্যের পাঠে। ধীরে ধীরে নিয়োজিত হয়ে গেলেন সৃষ্টির কাজে। ১৩২৮ সালের আষাঢ় মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর লেখা 'নারীর কথা' প্রকাশিত হল। রক্ষণশীল ঘরের গৃহবধূ হয়েও কলম হাতে প্রবেশ করলেন সাহিত্যের প্রাঙ্গণে— পিছনে ফেলে আসলেন স্বামীর সাহচর্যে কাটানো এক পূর্ণ গৃহিণীর জীবন। বৈধব্যের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলায় শুদ্ধ অন্তঃপুরবাসিনীর মন কিন্তু আধুনিকতার সীমানাকে ছুঁতে পেরেছিল, তাই নিজের সন্তানদের ছেলে ও মেয়েদের আলাদা করে দেখেননি। উভয়দেরই সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন, আর এই সাম্য দৃষ্টিই মেয়েদের হয়ে কথা বলতে সাহস জুগিয়েছিল। প্রতিবাদী ও স্পষ্টভাষায় বহু ছোটোগল্প রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। শৈশবে রাজস্থান, তারপর হুগলি জেলার গ্রাম, পরে স্বামীর সঙ্গে তাঁর কর্মস্থল পাটনা ও পরে দিল্লিতে বসবাসের সূত্রে তিনি নারীর চিরন্তন সমস্যা নিয়ে নানাদিক থেকে ভাবার রসদ পেয়েছেন। দেশের মধ্যেই ভিন্ন সংস্কৃতির আবহে অন্তঃপুরের মেয়েদের অভিন্ন সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করে সহানুভূতির সঙ্গে তাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই তাঁর উপন্যাস ও ছোটোগল্প কষ্টকল্পিত কাহিনি হয়ে ওঠেনি, সমকালীন জীবন সংস্কৃতি তাঁর লেখার অন্যতম বিষয় যা তাঁকে বহুল জনপ্রিয়তা দিয়েছিল। কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ বন্ধু হয়ে জ্যোতির্ময়ী দেবীকে পরিচিত করিয়েছিলেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় একটি কবিতা ও 'নারীর কথা' নামে প্রবন্ধের মাধ্যমে। এরপর তাঁর লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বেরোতে শুরু করে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রথম প্রকাশ কবিরূপেই। প্রথম জীবনে প্রচুর কবিতা লিখেছিলেন তিনি। পরে গল্প ও উপন্যাস। প্রথমদিকে 'সুমিত্রা দেবী' ছদ্মনামে লেখালেখি করতেন তিনি।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সহজ সরল ভাষা। কিন্তু এই ভাষার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক সুদৃঢ় ভঙ্গি। অকারণ জটিলতায় লেখার মূল বিষয়টি কখনোই হারিয়ে যায়নি। প্রথাগত ডিগ্রিধারী না হয়েও মানুষের মনোজগতের হদিশ পেয়েছেন খুব সহজেই। বিভিন্ন মনীষীদের জীবন-বাণী বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দের বাণীসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার করেছেন। নিজের দেখা জীবন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষায় বাস্তবের প্রেক্ষাপটকে তিনি নান্দনিকতার সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। ফলে তাঁর লেখা পড়ে

পাঠক একটি নির্দিষ্ট সময়ের দেশকালকে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়। তাঁর লেখার সময়টা বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী থেকেছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের বাংলা তথা ভারতে তখন ঘটনার ঘনঘটা। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সমস্ত ভারতবর্ষে তখন চূড়ান্ত অস্থিরতা, সেই প্রেক্ষাপট তিনি তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন। সবথেকে বড়ো কথা বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলী তাঁর সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছে। স্বাধীনতা, দেশভাগ প্রসঙ্গ তাঁর লেখা উপন্যাস 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'-তে এসেছে বাংলা সীমান্ত ও পাঞ্জাব সীমান্ত দুইদিকের সত্য ঘটনাকে সামনে রেখে। বাংলাদেশের মতো পাঞ্জাবের মানুষও যে দেশভাগের বলি সেটা বাংলা সাহিত্যে তাঁর লেখাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এভাবে বহির্বাংলা বিশেষত রাজস্থানের মানুষের জীবন ও সমাজচিত্র, মেয়েদের অবস্থান সবই তাঁর লেখায় জায়গা করে নিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সীমানা ভারতীয় হয়ে উঠেছে তার লেখনীর মাধ্যমে যা সেই যুগে বাংলা সাহিত্যে বিরল একটি ঘটনা। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল— 'চক্রবাল কবিতাগুচ্ছ', 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' (১৯৪৮), 'মনের অগোচরে' উপন্যাস (১৯৫২), 'আরাবল্লীর কাহিনী' ছোটোগল্প (১৯৬৫), 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাস (১৯৬৮), 'সোনারূপা নয়' ছোটোগল্প (১৯৬৯), 'ছায়াপথ', 'রাজযোটক', 'আরাবল্লীর আড়ালে' প্রভৃতি। দেশভাগ আর তার বিষময় ফল, নানা ঘটনার মধ্যে জীবনের ভাঙনের টুকরো টুকরো ঘটনা নিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তীতে নানা কোলাজ সাহিত্যের পাতায় তৈরি হয়েছে তারই একটি নিদর্শন জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' ছোটোগল্পটি। কাহিনির মধ্যে লেখিকার অনুভব ও জীবনদর্শন শিল্পিত সংযমের মাধ্যমে সংহত রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

একটি সুন্দর সাধ আহ্লাদে পূর্ণ জীবনের আকস্মিক বিপর্যয়, যার কেন্দ্রে রয়েছে দেশভাগের প্রত্যক্ষ প্রভাব সেই বিষয়টিকে নিয়েই কাহিনির প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে। গল্প তো কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে উড়তে চায় অনেক সময়। সেই কল্পনার মাঝে কখনও কখনও জড়িয়ে থাকে কঠোর নির্মম এক বাস্তবতা যা দেশকাল সমাজের এক বিশ্বস্ত দলিল হয়ে ওঠে। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' গল্পটির মধ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবী দেশভাগের বিষময় পরিণতিরই একটি ঝলক তুলে ধরেছেন।

পরিচিত বাসস্থান ও মায়ার বাঁধনে ঘেরা জন্মভূমি ছেড়ে অজানা অচেনা দেশে পাড়ি দিতে হবে দুর্গা, সুদামকে। একটি সুখী দম্পতি একে অপরের সুখ দুঃখের সাথী— পথে নেমেছে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যাবে মান, সম্মান ও ইজ্জত বাঁচাতে। বিধর্মী দেশে জান, প্রাণ বা সম্মান কোনোটারই ভরসা নেই। অগত্যা পথে নামা অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে এক দলভুক্ত হয়ে মনের শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা, ভরসা একটাই, সবাই একই সম্প্রদায়ভুক্ত। সবারই একই গন্তব্য। পথের রসদ সামান্যই। ঘর গেরস্থালির

হাজারো প্রয়োজনীয় জিনিস ফেলে আসতে হয়েছে তাদের। সামান্য কিছু সামগ্রী আর একরাশ যন্ত্রণাই তাদের চলার সম্পদ। নিম্ন মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া সওয়ারি হয়ে আসা নয়, পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছে দুর্গা-সুদামের মতো অসহায় মানুষেরা। অবশেষে অদৃশ্য রেলগাড়ির উপস্থিতি 'তীক্ষ্ণ বাঁশির কু' শব্দ শোনা গেল। তারপর আকাশে কালো ধোঁয়া মনের মধ্যে আনন্দের বান ডাকে পথে নামা মানুষগুলোর। মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে মনের হর্ষ প্রকাশ করে ফেলে। কয়েকজন পুরুষ হরিবোল ধ্বনি দেয়। তাদের এই আনন্দের উচ্ছ্বাস থামিয়ে দেয় এক প্রবীণ মানুষ। সাবধান করে দেয় বিধর্মী শত্রুদের দৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। পথের শেষভাগটুকু ভালোভাবে পার হয়ে অজানা দেশের নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পাড়ি দিতে চায় সবাই।

দুটি দেশ— মাঝখানে কাঁটাতারের বেড়া, সীমান্তে কত নজরদারি, আইন অনুযায়ী পাসপোর্ট ও আরো কতকিছুর আয়োজন। আর সামনের এই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শুধু পয়সার বিনিময়ে মানুষ পার হয়ে যাচ্ছে। যারা দিতে পারছে তারা দিয়ে চলে যাচ্ছে। আর যারা নিতান্ত অপারগ তাদের হেনস্থা হতে হচ্ছে। নাকাল হয়ে মাথা কুটতে হচ্ছে। এই অপারগ হয়ে থাকার দলে রয়েছে সুদাম ও তার স্ত্রী দুর্গা। পথের সাক্ষীরা যে যার মতন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যারা টাকা পয়সা দিতে পারল তারা দুই দেশের রক্ষীদের মন জুগিয়ে চলে যেতে পারল আর যাদের সেই অবস্থা নেই তারা অসহায়ভাবে "স্টেশনের প্রান্তে এক পাশে বসে থাকে।"

দেশের ক্রান্তিকাল— স্বাধীনতা এসেছে অথচ পূর্ববঙ্গের মানুষেরা জীবনকে বাজি রেখে জীবন বাঁচাতে চাইছে। ধর্মরক্ষা, সম্মানরক্ষায় ভরসা কেবল অদৃশ্য এক ইচ্ছাশক্তি যার ভরসায় নিজেদের অসহায় ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করেছে তারা। আর এই বিপর্যয় আরো বড়ো আকার ধারণ করেছে সুবিধাভোগী কিছু লোভী মানুষের দল, সীমান্ত পাহারায় অদৃশ্য টাকার লেনদেন করে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ছলে। কিন্তু যারা এদের লোভের অনলে পর্যাপ্ত ঘি ঢালতে পারবে না তারা যেন ধীরে ধীরে হরিয়ে যাবে এই শক্তিমানদের ভিড় থেকে। ঠিক যেন ডারউইনের সেই যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন তত্ত্বের মতো টিকে থাকার লড়াইতে শক্তি না থাকলে একসময়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে এ পৃথিবীর বুক থেকে। সুদাম ঋষি জাতে মুচি, সাথে তার সুন্দরী স্ত্রী দুর্গা। দেশভাগের কবলে পড়ে দেশ পারাপারের জন্য সীমান্তে আসলেও পার হওয়ার অনুমতি মেলে না। লোভী মানুষদের নজর পড়ে দুর্গার সুন্দর দেহপটের উপর। মুহূর্তে আদিম রিপুর তাড়নায় দুর্গাকে কুক্ষিগত করতে চায় তারা। সুদামের পাঁচটি টাকার বেশি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। অতএব তাদের আটকে থাকতে হবে সীমান্তর রেলস্টেশনে। দুর্গার দেহমধু পান করার উদগ্র ইচ্ছায় সুদামকে পঁচিশ টাকায় সীমান্ত পারের কথা বলে। মুহূর্তে বুঝে নেয় সুদামের অক্ষমতা। সমস্যার সমাধানে মরীয়া সুদাম কলকাতায় দুর্গার দাদার বাড়িতে যাওয়ার

কথা ভাবে, লোভী মানুষেরা উল্লসিত হয়ে ওঠে সুদামকে ভিনদেশে পাঠিয়ে দুর্গাকে একা করে দেওয়ার পরিকল্পনায়। স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারে যদিও দুর্গার থাকার ব্যবস্থা হয় তবুও সেটা তাদের মনে আশার সঞ্চার করে— সুদাম ফিরে না এলে সুন্দর শিকার তাদের হাতের মুঠোয়।

এ যেন শিকারকে পাওয়ার জন্য টোপ ফেলে অপেক্ষা করা। স্টেশন মাস্টারের বাড়ির নিরাপত্তা সাময়িক, আর সুদাম অপরিচিত দেশে গিয়ে ফিরে আসতে না পারলে একদিন এই মেয়েটি তাদের সামগ্রী হয়ে যাবে। স্টেশন মাস্টার কয়েকদিনের জন্য সুদামের স্ত্রীকে রাখতে সম্মত হলে বড়ো নিশ্চিন্ত হয়েছিল সুদাম। পয়সা নিয়ে ফিরে এসে সে নিয়ে যাবে দুর্গাকে। দুর্গা আর সুদাম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দুজনেই একরাশ চিন্তা আর এক চিলতে আশার আলোতে যেন জীবনকে বাজি রাখল। দুর্গা সুন্দরী অল্পবয়সি যুবতী— অপরিচিত ভিন্ন ধর্মের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে কেবল দিন গুনতে থাকে। তিনদিনের কথা বলে গেলেও সাত দিন এমনকি দশ দিনেও ফিরে আসে না সুদাম। প্রতিটি প্রহর অতিবাহিত হয়. উৎকণ্ঠায়। বাইরে লোভী মানুষেরা ওঁৎ পেতে আছে শুধু দুর্গার বাইরে পা দেওয়ার অপেক্ষায়।

"... স্টেশনের ফাজিল ছোঁড়াগুলো বিবিসাহেবের কাছে এসে দাঁড়ায়। নানা গল্পের মাঝে বলে "বিবিসাহেব ওকে কেন ঘরে পুষে রেখেছ। বিদেয় করে দাও। যেখানে ইচ্ছে যাক চলে।"[২]

দুর্গা স্তম্ভিত হয়ে আতঙ্কে কাঠ হয়ে যায়। যে দুরবস্থা ও অত্যাচার থেকে পালিয়ে আসা সেই ভয়ংকর পরিণতিই যেন গিলে খেতে আসে তাকে। স্টেশনের কুলিদের কদর্য মন্তব্য কানে আসে দুর্গার— সুদাম যে টাকা নিয়ে আর ফিরবে না সেটাই তারা বিশ্বাস করাতে চায় দুর্গা ও আশ্রয়দাতাকে। দুর্গার আত্মবিশ্বাস তলানিতে এসে ঠেকে যখন সে শুনতে পায়—

"... সে আবার আসবে টাকা নিয়ে। ঘাড় থেকে নামিয়ে বেঁচেছে বলে। এবার ছুঁড়িই কত টাকা রোজগার করবে। আমরাই খদ্দের দেখে দেবো।"[৩]

নিজের উৎকণ্ঠার পাশাপাশি বাইরের লাগাতার আক্রমণ দুর্গার আত্মবিশ্বাসকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়। যদিও আশ্রয়দাত্রী স্টেশন মাস্টারের বিবি তাকে আশ্বস্ত করেছিল, বাইরের কথায় কান দিতেও বারণ করেছিল কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা স্বামী-স্ত্রী যে আশ্রিত দুর্গাকে নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল সেটা দুর্গা তাদের টুকরো টুকরো আলাপচারিতা থেকে বুঝতে পারছিল। তার স্বামী সুদাম ফিরে আসবে কিনা এই ভাবনার সাথে জড়িয়ে থাকে দুর্গার ভবিষ্যৎ জীবন। স্টেশন মাস্টার যদিও তার স্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বলে— "... আসবে। জোয়ান পরিবার, অত রূপ তার সাথে আশঙ্কাও থাকে হয়তো কোনো বিপদে পড়েছে বা টাকার জোগাড় হয়নি।" আশঙ্কার মেঘ ঘনীভূত

হয় তার বিবির উক্তিতে— "আহা জোয়ান মেয়েটা। কি হবে কে জানে। সে যদি না আসে, কতদিন তুমি রাখতে পারবা এই হাঙ্গামা হুজ্জুতের দিনে।"[৪]

বিনিদ্র দুর্গা ভাবে স্বামী না ফিরলে সে কী করবে। ছেড়ে আসা গ্রামে, রাস্তায় মেয়েদের দেহ নিয়ে পৈশাচিক উল্লাসের ভয়াবহ রূপ তো সে দেখেছে। যে আতঙ্কে তারা নিজেদের বাসভূমি ছেড়েছে সেই ভয়ংকর পরিণতিই কি তার ভবিতব্য! সুদামের জন্য অপেক্ষা করার শক্তি ধীরে ধীরে যেন কমে যেতে থাকে দুর্গার। পরিস্থিতি যেন প্রতিকূল হতে থাকে। স্টেশন মাস্টার ও তার স্ত্রী ক্রমেই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতে থাকে সুদামের ফিরে আসা নিয়ে। রান্নাবান্না বন্ধ করে দেয় দুর্গা, ক্রমে খাওয়া দাওয়াও। শেষ পর্যন্ত ২১দিন বাদে ফিরে আসে সুদাম টাকা পয়সা সমেত। অনেক কষ্টে ২৫টি টাকা সে সংগ্রহ করে আনতে পেরেছে, দুর্গাকে নিয়ে সেইদিনই সে চলে যাবে বলে। কিন্তু যার জন্য তার এত পরিশ্রম সে তার অপেক্ষায় আশা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেনি। পচা পুকুরে গলায় ইট বেঁধে নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কা থেকে মুক্তি পেতে ডুবে মরেছে। সুদামকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে স্টেশন মাস্টার ও তার বিবি। তারা যখন দুর্গার ভয়াবহ পরিণতির কথা বলে তখন সুদাম মানতে পারে না দুর্গার অন্তিম পরিণতিকে। যার হাত ধরে ঘর ছেড়েছিল তাকেও সে ধরে রাখতে পারল না। মনের মধ্যে দুর্গার সুগভীর অস্তিত্ব নিয়ে সুদাম বাইরেও ক্রমাগত তাকেই খুঁজে বেড়ায়। অচেনা দেশে অচেনা মানুষের মাঝে চেনা একটি মুখের অন্বেষণে দিনগুলি শেষ হয়ে যায়। নতুন দিনের শুরুতে নতুন করে শুরু হয় তার প্রিয় মানুষের অন্বেষণ পর্ব। দেশভাগের প্রত্যক্ষ প্রভাব কাহিনির মধ্যে সমকালকে সজীব বাস্তবতায় ধরে রেখেছে। দুর্গার মৃত্যুকাহিনির অন্তিম মোড় এনে ছোটোগল্পে আকস্মিকতা ও সম্পূর্ণতা সাধন করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিষাদাত্মক করুণ এক পরিণতি গল্পের উপসংহারে ট্র্যাজেডির রূপকে ফুটিয়ে তুলে পাঠককে নিয়ে গেছে সেই দেশকালের পটভূমিকায়। দুর্গা তো আসলে অসংখ্য অসহায় ঘর ছাড়া মেয়েদের প্রতিনিধি মাত্র। পরিবার পরিজন, সম্মান সবকিছুই যখন ক্রান্তিকালে বিক্রয় হয়ে যায় তখন অসংখ্য দুর্গা এভাবেই অকালে নিজেদের নিঃশেষ করে দিতে বাধ্য হয়। অর্থনৈতিক অসাম্য, লোভী মানুষের পৈশাচিক লোভ, রাষ্ট্রনায়কদের অদূরদর্শিতা ও ব্যক্তিস্বার্থ ঘরের দেওয়াল ভেঙে দিয়ে মানুষকে পথে নামিয়ে নিয়ে আসে। মুহূর্তের মধ্যে জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। সম্মান, আব্রু, স্বস্তি, গৃহশান্তি সবকিছুই ধ্বসে যায়। থেকে যায় সব হারানো বেঁচে মরে থাকা মানুষগুলোর দীর্ঘনিঃশ্বাস। সুদাম তো বেঁচে থেকেও আসলে মারা গেছে, তার দেহটাকে সে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দুর্গাকে হারিয়ে সুদাম তো জীবন্ত এক মৃত মানুষেই রূপান্তরিত হয়।

একটি বিয়োগান্তক পরিণতি গল্পের মূল বিষয়কে ইতিহাসের এক নিদারুণ ঘটনার সাক্ষ্যকে বহন করছে। কল্পনার দুর্গা তো আসলে নিদারুণ বাস্তবেরই প্রতীক। দুর্গা নামের

সাথে দুর্গতিনাশিনীর সংযোগ থাকলেও এই কাহিনিতে সে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়া অসহায় এক নারী, যে জীবন শৃঙ্খলে আটকা পড়ে হারিয়ে গেছে।

মূলত দুটি চরিত্র সুদাম ও দুর্গাকে নিয়ে মূল কাহিনি গড়ে উঠলেও এখানে সমকালীন সময় ও পরিবেশই সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ক্রান্তিকালীন পরিবেশে মানুষ পরিস্থিতির চাপে দিশেহারা হয়ে গেছে এখানে সেই অগ্নিগর্ভ প্রতিকূল সময়কে তুলে ধরার জন্য লেখিকা দুটি চরিত্রকে মাধ্যম করেছেন। সুদাম ও দুর্গা প্রতিকূলতাকে জয় করে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল কিন্তু পথে নেমে পথের শেষ পর্যন্ত তারা একসাথে হাঁটতে পারল না। অনিচ্ছাকৃত এই বিচ্ছেদের দায়ভার কিন্তু তাদের নয়। খুব বেশি আয়োজন বা আড়ম্বর তারা চায়নি, কেবল দুজনে ভালোবেসে একে অপরের সঙ্গে নতুন করে বাঁচার একটা ঠিকানা তৈরি করতে চেয়েছিল। কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে দিল না। সুদামের সমস্ত প্রচেষ্টাই এক নিমেষে অর্থহীন হয়ে গেল।

সুদামের এই শূন্য জীবনের দায়ভার আসলে দেশের নীতি নির্ধারণকারীদের, যাদের ক্ষমতালিপ্সা ও ভ্রান্ত নীতির পরিণতি হল এই দেশভাগ। সুতপা ভট্টাচার্যের লেখায় প্রতিফলিত হয় সেই কথা—

> দেশভাগের সমস্যা শুধু বাংলারই নয়, পাঞ্জাবের বহু মানুষকেই পিতৃপুরুষের মাটি ছেড়ে নিরাপত্তা ছেড়ে সর্বস্ব হারিয়ে পথে নামতে হয়েছে। ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে হয়েছে। দুর্গতিগ্রস্ত হয়েছে সমগ্র পরিবার কিন্তু তারো মধ্যে মেয়েদের সমস্যা কঠিনতর এইজন্য যে তারা যৌনসামগ্রী, লুণ্ঠনের উপযুক্ত। সর্বনাশেরও এক মেয়েলি মাত্রা আছে।[৫]

আর মেয়েদের যৌনসামগ্রীতে পরিণত হওয়ার সুস্পষ্ট তথ্য রয়েছে জ্যোতিময়ী দেবীর অন্য আরেকটি গল্প 'সেই ছেলেটা'-র মধ্যে। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' দুর্গা যৌনসামগ্রী হতে না চেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল আর 'সেই ছেলেটা' গল্পে বাংলা থেকে বহু দূরে পাঞ্জাবের হিন্দু পরিবারেও একই ভয়ংকর নির্মম পরিণতির ছবি এঁকেছেন লেখিকা। দাঙ্গার রাতে লাহোর থেকে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সবাই পুলিশের গাড়িতে উঠতে পারলেও বাড়ি থেকে সময়মতো বেরিয়ে আসতে পারেনি রাজকুমারীর মা। তাকে খোঁজার সুযোগ আর কেউ দেয়নি। সীমান্তে বহু খোঁজাখুঁজি ও প্রতীক্ষার পরও আর তার দেখা পাওয়া যায়নি। বহুদিন পর রাজকুমারী দিল্লির রাস্তায় এক ভিখারিণীকে দেখতে পায় একটি ছোটো ছেলের হাত ধরা অবস্থায়। মা হিসেবে তাকে যখন সে চিনতে পারে তার আগেই সেই নারী সেখান থেকে চলে যায়। পরে রাজ হিসেব মিলাতে গিয়ে মায়ের হাতে ধরা ছোটো ছেলেটির পরিচয় বুঝতে চেষ্টা করে। অবশেষে জটিল সমস্যার সমাধান হয়। দাঙ্গার পরিণতিতে তার মা যে যৌন লালসার শিকার

হয়েছিল এ সন্তান তারই ফলশ্রুতি। ফলে রাজ তার মাকে চিনে নিলেও ছেলেটি যে তার ভাই নয়, সেটায় কোনো সন্দেহ থাকে না।

মেয়েদের এই যন্ত্রণার দিক ছাড়াও আরো নানাদিক থেকে দেশভাগ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। সমকালীন আরো কয়েকজন লেখকের কলমে উঠে এসেছে সেই বিপর্যয়ের দিক। অচেনা পথে অসুস্থ সন্তান যাদবকে নিয়ে পরাশর ও তার স্ত্রী মোহিনী চলেছে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে। 'পথের কাঁটা' গল্পে রমেশচন্দ্র সেন এই অসহায় দম্পতির লড়াই এক ভিন্ন মাত্রায় এঁকেছেন। দশ-এগারো বছরের বালক যাদব হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে দাঁড়ায় নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য আর তখনই বাবার কাছে ধমক খায়— "এই হারামজাদা হইছে পথের কাঁটা।" চলার পথে গতিরুদ্ধ হয় ছেলের শ্লথগতিতে তাই পিতার চোখে সে কাঁটারূপ শত্রু। পিতার অনুভব এখানে কিছুটা স্বার্থান্ধও বটে। তাব গল্পের শেষে এক ইতিবাচক জীবনবোধ বাঁচার লড়াইকে নতুন করে প্রাণ দেয়। একটি সন্তান পিতার পথের কাঁটা হলেও শেষে পরাশর কলেরায় সদ্য মৃত এক মায়ের বুক থেকে দুধের শিশুকে পিতৃত্বের অধিকার দেয়। স্ত্রী মোহিনী বা অন্যদের কথাও তাকে এ সিদ্ধান্ত থেকে নড়াতে পারে না। নতুন করে বাঁচার আলো পায় অসহায় এক মাতৃহারা শিশু। ঘর ছেড়ে পথে নেমে একদল যখন কলেরা মহামারির শিকার হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে তখন পাশে এক উদার মনের অপরিচিত পুরুষ মানুষ মাতৃহারা শিশুকে স্নেহ মমতায় কাছে টেনে নিচ্ছে। পথে নেমে নিজের সন্তানকে পরাশরের পথের কাঁটা মনে হলেও শেষে সেই অপরিচিত মৃতপ্রায় এক দুধের শিশুকে পুত্রস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে পিতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছে সে, চরম বিপর্যয়ের সময়েও মানবিকতার এ নজির জীবনের আশাবাদকেই তুলে ধরে।

সুখ-দুঃখ, আলো-আঁধারের মতোই, আশা-নিরাশার দোলায় ভরে থাকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। সেইরকম সাহিত্যের পাতায় একদিকে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির বিপর্যয়ে আশাবাদের সাথে হাত ধরে নৈরাশ্যের অন্ধকারও জীবনকে ভিন্ন খাঁতে টেনে নিয়ে যায়। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' কাহিনির নৈরাশ্যের সঙ্গে সাবিত্রী রায়ের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' গল্পটির কাহিনিতেও একটা বিষাদাত্মক পরিসমাপ্তি লক্ষ করা যায়। পরিবারের সবাই দেশ ত্যাগ করে চলে গেলেও দীর্ঘদিনের আশ্রিতা পরিচারিকাকে ফেলে রেখে চলে যায়। একাকী নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা নিয়ে বেঁচে থাকাই যেন তার ভবিতব্য হয়ে ওঠে।

সুলেখা সান্যালের 'ফল্গু' গল্পেও দেশভাগের ফলে হঠাৎ করেই পারিবারিক বিচ্ছেদের মুখোমুখি হতে হয় বিধবা প্রৌঢ়া মহেশ্বরীকে। সে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েও শেষ মুহূর্তে নিজের আজন্ম পরিচিত মাটির টানকে ছিঁড়তে পারে না। তবে প্রতিবেশী মুসলমানদের ছোঁয়া চিরকাল সে বাঁচিয়ে চললেও নিঃসঙ্গ একাকী জীবনে সেই মুসলিম পরিবারের বালকই তার অসুস্থতার সময় ত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করে। সাম্প্রদায়িকতার

বিভেদের পাশে এ গল্প কিছুটা ইতিবাচক জীবনের সন্ধান দেয়।

দেশভাগ ও তার ভয়াবহ পরিণাম বাংলা-পাঞ্জাব উভয় সীমান্তের মানুষকেই এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছিল। আকস্মিকতার ধাক্কায় অনেকক্ষেত্রেই জীবনটাকে শুধু বাজি রাখতে হয়েছিল সাধারণ মানুষকে। তবুও বাঁচার রসদটুকু অনেকের ভাগ্যেই জোটেনি। সুযোগসন্ধানী মানুষ স্বার্থের লোভে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অসহায় নিরাশ্রয় মানুষের উপরে, তার পরিণামে অকালে ঝরে গেছে কত আশা-আকাঙ্ক্ষা ভরা জীবন। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'-য় দুর্গার মৃত্যু সেই সত্যকেই যেন তুলে ধরেছে। এখানে দুর্গা দুর্গতিনাশিনী নয় বরং নিজেই যেন শোষিত এক সত্তা। এ গল্পের এই দুটি চরিত্রকে সামনে রেখে জ্যোতির্ময়ী দেবী দেশভাগের সময়কালের উত্তাপকে যেন অনুভব করাতে চেয়েছেন। তাই সুদাম ও দুর্গা ব্যক্তি পরিচয় থেকে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠে। নাম, পদবি, বংশ পরিচয়কে মুছে তারাই ইতিহসের নায়ক-নায়িকা যাদের অসহায় করুণ পরিণতি এক ক্রান্তিকালের ভয়াবহ সময়কে মনে করায়। দুই গঙ্গার মাঝে হারিয়ে যায় কত স্বপ্ন। এ গল্পে ট্র্যাজেডি তো সেই হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের দলিল, যা ঐতিহাসিক ক্ষতকে নীরবে বহন করে চলেছে। আজকের আধুনিক জীবন সংকটে এই উদ্বাস্তু সমস্যা সারা পৃথিবীর কাছে সেই পুরোনো স্মৃতিকে নতুন করে মনে করাচ্ছে। বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবীতে ২২.৫ মিলিয়ান শরণার্থী রয়েছে। এর মধ্যে ৬ কোটি ৫৬ লক্ষ মানুষ ঘর বাড়ি ছেড়েছে। শরণার্থী হিসেবে জীবন কাটাচ্ছে ২ কোটি ২৫ লক্ষ মানুষ। এদের মধ্যে ১ কোটি মানুষের কোনো পরিচয় নেই। কোনো নির্দিষ্ট জাতিগত পরিচয় না থাকায় এইসব মানুষেরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি ও স্বাধীনভাবে চলারও কোনো অধিকার পায় না। বিশ্বের ৫৫ শতাংশ শরণার্থী এসেছে দক্ষিণ সুদান, আফগানিস্তান এবং সিরিয়া থেকে। যুদ্ধবিগ্রহ সহ নানা সমস্যার কারণে বর্তমানে এইসব দেশের মানুষেরা শরণার্থী হিসেবে পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে চলে আসছে। বর্তমান বাংলাদেশে রোহিঙ্গা উপজাতির অসংখ্য মানুষ শরণার্থী হিসেবে মিয়ানমার থেকে চলে এসেছে। সত্তরের দশক থেকে এই অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। কক্সবাজারে 'কুতুপালং মেগা' শিবিরে ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের এই শরণার্থী শিবির বিশ্বের মধ্যে সব থেকে বড়ো শিবির হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রতি বছর জুন মাসের ২০ তারিখ আন্তর্জাতিক শরণার্থী দিবস পালনের মাধ্যমে বিশ্বের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে শরণার্থী নামে চিহ্নিত অসহায় মানুষগুলোর জাতিগত পরিচয় পাওয়ার দিকটিকে গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা ভাবা হয়েছে। ভারতবর্ষের দুটি প্রদেশের (পাঞ্জাব ও বাংলা) মানুষ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশভাগ ও শরণার্থী হয়ে অস্তিত্ব রক্ষার কঠিন লড়াই পার করে আজ স্থিতি লাভ করেছে। আজকে তাদের নিরাপদ জীবনের পিছনে লুকিয়ে আছে অসংখ্য যন্ত্রণা ও অশ্রুজলের করুণ কাহিনি, যা আজকের সারা বিশ্বের বিভিন্ন

প্রান্তের ছিন্নমূল মানুষদের কঠিন লড়াইকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা সমকালীন লেখকদের কলমে সেই গভীর যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের কাহিনিকেই খুঁজে পাই। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'-র সুদাম, দুর্গা বা 'সেই ছেলেটা' গল্পের রাজকুমারী, 'পথের কাঁটা' (রমেশচন্দ্র সেন) গল্পে পরাশর, মোহিনী, যাদব সবাই ভিন্ন নামের ব্যক্তি, যাদের অভিন্ন জীবনযন্ত্রণা আজকের অগণিত নারী-পুরুষ-শিশুর প্রতিচ্ছবি মাত্র।

যুগ বদলেছে, দেশ বদলেছে কিন্তু উদ্বাস্তু হওয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক কারণ খুব বেশি বদলায়নি। জাতিগত সহিংসতা, ধর্মীয় উগ্রতা, জাতীয়তাবোধ, রাজনৈতিক আদর্শগত কারণে সমাজবদ্ধ জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তাহীনতাই এর প্রধান কারণ। সঙ্গে আছে দেশনেতাদের ভ্রান্ত জননীতি।

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' গল্পে জ্যোতির্ময়ী দেবী বিচ্ছেদের যে সুর তার কাহিনিতে রোপণ করেছেন তার অনুরণন তো আজকের যে-কোনো শরণার্থী শিবির বা ছিন্নমূল মানুষদের খুব স্বাভাবিক চিত্র। শূন্য দৃষ্টিতে সুদামের ভালোবাসার মানুষের অন্বেষণ আজও চলেছে অন্য নামে অন্য পরিচয়ে। মানুষের এই যন্ত্রণাময় সফর থেকে ভবিষ্যতের কোন প্রজন্ম মুক্তি পাবে তার উত্তর আমাদের জানা নেই। মানবিক অনুভূতি ও শুভবুদ্ধিই হয়তো একদিন এই মানুষগুলিকে যথার্থ সম্মান দিতে পারবে, ফিরিয়ে দিতে পারবে তাদের মৌলিক অধিকারটুকু। নাহলে কত দুর্গা অকালেই পথে নেমে হারিয়ে যাবে খুঁজে না পাওয়ার দেশে। সমষ্টির মঙ্গল ব্যক্তিস্বার্থকে ঘিরেই তৈরি হয়। তাই প্রতিটি ব্যক্তির স্বপ্ন পূরণের দায় হয়তো কিছুটা হলেও রাষ্ট্রের থেকেই যায়। সেই দায়ভারকে অস্বীকার করলে বঞ্চনা ও অসাম্যের যে অন্ধকার সমাজের কিছু অংশকে রুদ্ধ করে রাখবে তার বিষময় ফল হয়তো আগামী প্রজন্মকে বহন করতে হবে। আগামীর সুন্দর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সেই কারণে আজ আমাদের ফিরে যেতে হবে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাছে। তার সুরে সুর মিলিয়ে আজ আবার নতুন করে বলার দিন এসেছে—

> ...এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
> নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।[৫]

তথ্যসূত্র :

১. আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৬৪), শুচিব্রত সেন, অমিয় ঘোষ, পৃ. ৪৫৬
২. ভেদ-বিভেদ, দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সর্বভারতীয় গল্প সংকলন, ভদ্রেশ্বর মণ্ডল, জ্ঞান ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশনা — আগস্ট ১৯৬৫, পৃ. ৪৮
৩. তদেব, পৃ. ৪৮
৪. তদেব, পৃ. ৪৮
৫. মেয়েদের লেখালেখি, সুতপা ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ — জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১০৬